হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আত্মার আলো

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা বৃহস্পতিবার মে-জুন ২০১৭ ॥ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ ॥ ৫ রমজান ১৪৩৭ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

মহিমান্বিত লাইলাতুল কদরের ফজিলত ও মর্যাদা

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

হযরত মা আয়েশা (রাঃ) রাসুল (সঃ) কে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন– হে রাসুলুল্লাহ! (সঃ) আমি যদি লাইলাতুল কদর পাই তখন কী করবো? উত্তরে আল্লাহর হাবীব বললেন– 'তুমি বলবে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'ফু আন্নি'– অর্থ্যাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করে দিতে ভালোবাসেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।' (তিরমিজি শরীফ)

রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস পবিত্র মাহে রমজান। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে হাজার রজনীর গর্বিত এক লাইলাতুল কদর। মহিমান্বিত এ রজনী অতি বরকতময় কারণ, এই রাতের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও মর্যাদা সবচেয়ে বড় এবং এর বৈশিষ্ট্য হলো কুলকায়েনাতের রহমতের কাণ্ডারী আখেরী নবী রাসুলুল্লাহর (সঃ) এর ওপর পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। বনী ইসরাইলের শামউল নামক এক 'আবিদ-জাহিদ' ব্যক্তির কঠোর সাধনা সম্পর্কে রাসুল (সঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের সম্মুখে বলছিলেন– 'সেই মহৎ ব্যক্তি এক হাজার মাস লাগাতার দিবাভাগে সিয়াম ও জিহাদরত থাকতেন এবং সারারাত জেগে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।' নবী (সঃ)এর জবান মোবারকে সাহাবীগণ এমন কঠোর সাধক ও নেককার মুমিন ব্যক্তির কথা শুনে বলতে লাগলেন, হায়! আমরাও যদি এ লোকটির মত দীর্ঘায়ু পেতাম তাহলে আমরাও ওই রকম দিন-রাত্রি ইবাদত-বন্দেগী করে কাটিয়ে দিতাম। ঠিক এমন সময়ই 'সুরা কদর' রাসুল (সঃ) এর ওপর নাজিল হয়– 'নিশ্চয়ই আমি তা (কোরআন) অবিতীর্ণ করেছি

> শবে কদরের যাবতীয় ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করে এই রাতের অপার বৈশিষ্ট সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– 'হা-মীম! শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা (কোরআন) এক মুবারকময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী

২-এর পাতায় দেখুন

ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রঃ) ও আধ্যাত্মিকতা

নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি

আমরা সুন্নি মুসলমান হানাফী মাজহাবের অনুসারী, আমাদের ইমাম, ইমামে আজম হজরত আবু হানিফা (রঃ)। তাঁর আসল নাম নোমান বিন সাবেত। তিনি ছিলেন তাবেঈ। একশত পঞ্চাশ হিজরীতে ইরাকের বাগদাদে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর জীবন ও কর্মের প্রতি গভীর দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, সবকিছুর মধ্যেই ইলমে তাসাউফের রূপরেখা সফলভাবে বিকশিত হয়ে আছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সদয় অনুগ্রহপ্রবণ ও উত্তম রীতিনীতির এক উজ্জল নির্দশন। সেই সময় তাঁর মাধ্যমেই ইলমে তাসাউফের ব্যাপক বিস্তার লাভ করেন। 'দুর্রে মুখতার' কিতাবের লেখক আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন হাছকুফি (রঃ) [মৃত্যু ১০ই শাওয়াল ১০৮৮ হিজরী] বলেন– আমি ইলমে তাসাউফ অর্জন করেছি হজরত শিবলী (রঃ) থেকে, তিনি হজরত ছিররী সকতী থেকে, তিনি হজরত মারূফ কারখী (রঃ) থেকে, তিনি হজরত দাউদ তায়ী থেকে, তিনি ইলমে তাসাউফ, ইলমে হাদিস ও ইলমে ফিকাহ অর্জন করেছেন ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবেত (রঃ) থেকে।' আল্লাহতায়ালার সুগভীর ভেদতত্ত মারেফতের অমূল্য এ জ্ঞান তিনি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, খাঁটি যোগ্য শিষ্য তৈরি করে গেছেন। তাঁরাও নিরলসভাবে দেশ থেকে দেশান্তরে, বন থেকে বনান্তরে নিয়ে গেছেন ঐশী আলোর বাণী এবং সত্য পথের দিশা দিয়ে মানুষ ও সমাজের আঁধার দূর করেছেন। বিভিন্ন কিতাবের বর্ণনায় এসেছে যে, শতশত শতাব্দীর ব্যবধানে এমন চারজন শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন যারা ইলমে তাসাউফের মধ্যে থাকার কারণে তাঁদের জীবন মর্যাদা ও অবস্থান উজ্জল নক্ষত্রের মতো সারাজাহানে আলোকিত হয়েছে। ইমাম মহিউদ্দিন শরীফ নদভী 'আল মাকসাদ' কিতাবে আধ্যাত্মিক সাধনার মূলনীতি বর্ণনায় লিখেছেন– নির্জনতায় বা অনির্জনতায় সর্বাবস্থায় আল্লাহতায়ালার তাকওয়া অবলম্বন করা। কোন কাজ বা উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে হুজুরপাক (সঃ) এর কাজ বা উপদেশ অনুসরণ করা। অধিক বা স্বল্প রিযিকে আল্লাহর উপর কৃতজ্ঞ থাকা। সুখে-দুঃখে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ থাকা। তেমনই আমাদের হানাফী মাজহাবের আরো একজন অলিআল্লাহ যিনি ইলমে তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিক মহাসাধক হজরত জুনাঈদ বোগদাদী (রঃ) তাঁর তরিকার মূল নীতি বা আদর্শে মধ্যে রয়েছে– কোন আমল লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না করে ইখলাসের সঙ্গে আমল করা। ইমামে আজম আবু হানি-ফা নোমান বিন সাবেত (রঃ) তাসাউফপন্থি তথা সূফী-সাধকদের আধ্যাত্মিক মহাগুরু ছিলেন। তাঁর সমস্ত জীবনই যে ইলমে তাসাউফের মধ্যে বিশেষত্বের সঙ্গে

২-এর পাতায় দেখুন

খাজাবাবা কুতুববাগীর অমূল্য অমিয় বাণী

- রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বতই প্রকৃত ঈমান। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততটুকু।
- কলব আল্লাহ ভেদের মহাসমুদ্র এবং এই কলবের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়।
- আরেফ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার দীদার ব্যতীত দুনিয়ার কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না।
- নষ্টদের কোন দল নেই, এরা স্বার্থের জন্য সকল পরিচয়েই পরিচিত হতে চায় ।
- সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লেও আবার ওঠে কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে ধ্বংস হয়।
- সেই যথার্থ মানুষ, যে জীবনের পরির্বতন দেখেছে এবং পরিবর্তনের সাথে নিজেও পরিবর্তন হয়েছে।
- অন্যকে বারবার ক্ষমা করো কিন্তু নিজেকে কখনোই ক্ষমা করিও না।
- যৌবন যার সৎ, সুন্দর ও কর্মময়, তার বৃদ্ধ বয়সকে স্বর্ণযুগ বলা হয়।
- সময় বেশি লাগলেও ধৈর্য্য সহকারে কাজ কর তাহলেই প্রতিষ্ঠা পাবে।
- একজন অলস মানুষ, স্বভাবতই খারাপ মানুষ।
- ভালোবাসার জন্য যার পতন হয়, সে-ই বিধাতার কাছে আকাশের তারার মত উজ্জ্বল।
- সে-ই সত্যিকারের মানুষ, যে অন্যের দোষ-ত্রুটি নিজের দোষ-ত্রুটি দিয়ে বিবেচনা করতে পারে।
- আল্লাহর ভয় মানুষকে সকল ভয় থেকে মুক্তি দেয়।
- বিশ্বাস জীবনকে গতিময়তা দান করে।
- প্রতিদিন তোমার এমনভাবে কাটানো উচিত যেন আজ জীবনের শেষ দিন।
- একজন মানুষের মহত্ত্ব বোঝা যায়, ছোট ব্যক্তিদের সাথে তার ব্যবহার দেখে।
- মানুষ শুধু যে মানুষের কাছ থেকে শিখবে তা নয়, পশু পাখির কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়।
- চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।
- যে নিজেকে দমন করতে পারে না, সে নিজের জন্যেও বিপজ্জনক এবং অন্য সবার জন্যেও।
- রাগকে শাসন না করলে রাগই মানুষকে শাসন করে।
- যে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, সে সেই বিষয়ে শিক্ষিত। কাজেই সবাই শিক্ষিত।
- ঝগড়া চরমে পৌঁছার আগেই ক্ষ্যান্ত হও।

পবিত্র মাহে রমজান

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ্
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

শরিয়ত ও তরিকতের দৃষ্টিতে মাহে রমজানের গুরত্ব : এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে সূরা বাকারাহ্ ১৮৩-১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেন– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযী-না আ-মানূ কুতিবা 'আলাইকুমুছ্ ছিয়া-মু কামা-কুতিবা 'আলাল্লাযীনা মিন্ ক্বব্লিকুম্ লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন্। আইয়্যা-মাম্ মা'দূদা-ত; ফামান্ কা-না মিন্কুম মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখর;অ'আলাল্লাযীনা ইয়ুত্বীকূ নাহূ ফিদ্ইয়াতুন্ ত্বোয়া'আ-মু মিস্কীন্;ফামান্ তাত্বোয়াও য়্যা'আ খইরন্ ফাহুওয়া খইরুল্লাহ্; অআন্ তাছূমূ খইরুল্লাকুম্ ইন কুন্তুম্ তা'লামূন্। শাহরু রমাদ্বোয়া-নাল্ লাযী উন্যিলা ফীহিল্ কু র্আ-নু হুদাল্ লিন্না-সি অবাইয়্যিনা-তিম্ মিনাল্ হুদা-অল্ ফুরক্বা-নি ফামান্ শাহিদা মিন্কুমুশ্ শাহর ফাল্ইয়াছুম্হু অমান্ কা-না মারীদ্বোয়ান্ আও 'আলা-সাফারিন্ ফা'ইদ্দাতুম্ মিন্ আইয়্যা-মিন্ উখর; ইয়ুরীদুল্লা-হু বিকুমুল্ ইয়ুস্রা অলা-ইয়ুরীদু বিকুমুল্ 'উস্র অলিতুক্মিলুল্ 'ইদ্দাতা-অলিতুকাব্বিরুল লা-হা 'আলা-মা-হাদা-কুম্ অলা'আল্লাকুম্ তাশকুরূন্।

অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে, অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় তারা এর পরিবর্তে একজন মিস্কীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সঙ্গে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার। রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য রোজা সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না, যাতে তোমরা গণনা পূরণ করে এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার জন্য আল্লাহতা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

ক্বালান নাব্বিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুল্লু আমালিবনী আদামা ইউদাইফুল হাছানাতু বিয়াআস্রী আমছালীহা ইলা সাব-ই মিয়াতী দি'ফীন ক্বালাল্লাহু তা'য়ালা ইল্লাছ ছাওমু ফা-ইন্নাহু লি ওয়া আনা আজযিবিহী ইয়াদাউ শাহওয়াতাহু ওয়া তয়ামাহু মিন আজলি লিছ ছাইমি ফারহাতানি। ফারহাতুন ইনদা ফিৎরিহী ওয়া ফারহাতুন

২-এর পাতায় দেখুন

মহিমান্বিত লাইলাতুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কদরের রাতে। আর কদরের রাত সম্বন্ধে তুমি কি জানো? কদরের রাত সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয়, প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি বিরাজ করে উষার আবির্ভাব পর্যন্ত। (সুরা আল কদর, আয়াত ১-৫)

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে– 'যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে কদরের রাতে দণ্ডায়মান হয়, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।' এবং রাসুল (সঃ) রমজানের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন আর বলতেন–' তোমরা রমজানের শেষ দশ রাতে শবে কদর অনুসন্ধান করো।' আল্লাহর নিগুঢ় ভেদের কারণেই রাসুলুল্লাহ (সঃ) এই রজনীর হাকিকত প্রকাশ না করে শুধু ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন– পথিমধ্যে অমুক, অমুক, কদরের নির্ধারিত রাতের বর্ণনা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমরা ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকো এবং তা মিটিয়ে নাও। আর রমজানের শেষ দশভাগের বে-জোড় সংখ্যার রাতগুলোতে 'শবে কদর' সন্ধান করো!' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ) সুতরাং অতি বরকতপূর্ণ এ রাতে নফল নামাজ, জিকির-আসকার, ধ্যান-মোরাকাবা-মোশাহাদা, কোরআন তিলওয়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করলে জীবন ও আখিরাতের মঙ্গল হয়। রাসুল (সঃ) বলেন– 'সিজদায়, বান্দা তার প্রভুর নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তাই তোমরা অধিক দোয়া করো।' (মুসলিম শরীফ) শবে কদরের যাবতীয় ইবাদতের প্রতি ইঙ্গিত করে এই রাতের অপার বৈশিষ্ট সম্পর্কে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– 'হা-মীম! শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, নিশ্চয়ই আমি তা (কোরআন) এক মুবারকময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ধারণ করা হয়।' (সুরা আদ-দুখান, আয়াত ১-৪) এসময় আল্লাহতায়ালার খাস রহমত অজস্র ধারায় বর্ষিত হয় এবং হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অসংখ্য ফেরেশতা নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। আর সকাল না হওয়া পর্যন্ত নামাজ ও জিকিরে ইবাদতরত বান্দাদের নাজাতের জন্য দোয়া করতে থাকেন। শবে কদরে চার ধরণের মানুষের প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না, এরা হলেন মদপানে অব্যস্ত ব্যক্তি, বাবা- মায়ের অবাধ্য সন্তান, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং হিংসা-পোষণকারীর ও সম্পর্ক ছিন্নকারী। তাদের কোন কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না, যতক্ষণ না তারা এসব অপকর্ম থেকে সংশোধন হবে।' (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খণ্ড) মহিমান্বিত এরজনীকে মহান আল্লাহতায়ালা নিজেই হাজার মাসের চেয়েও উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। এ অমূল্য রাতকে যে

> রাসুলুল্লাহ আরোও বলেন– 'তোমরা তোমাদের কবরকে আলোকিত পেতে চাইলে কদরের রাত ইবাদতে কাটিয়ে দাও। পবিত্র মাহে রমজানের পুণ্যময় এ রজনী বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত, বরকত ও ক্ষমা লাভের এক অপূর্ব সুযোগ। মহিমান্বিত এ রজনীতে উচিত নিজেকে পরিচ্ছন্ন রেখে ফরজ নামাজ আদায় করা তার সাথে সান্নত নামাজসহ কোরআন তিলওয়াত করা

ব্যক্তি কাজে লাগাতে পারলো না, রাসুল (সঃ) তাকে হতভাগা বলেছেন। এও বলেছেন যে, উম্মতগণ যদি চায় তবে এ রাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে। এ রাতের প্রত্যেকটি আমল মহান আল্লাহর কাছে গৃহিত হয়, কেবল চার শ্রেণির ব্যক্তি ছাড়া।

লাইলাতুল কদর পরবর্তী এক বছরে বান্দার সকল বিধিলিপি করে নির্ধারিত ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং এই বিধিলিপিতে মানুষের জীবন-মৃত্যু, রিযিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমানও উল্ল্যেখ করা থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা– 'দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন প্রধান ফেরেশতা যথাক্রমে ঃ হযরত ইসরাফিল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ), হযরত আজরাইল (আঃ) ও হযরত জিবরাইল (আঃ)।' (তাফসীরে মারেফুল কোরআন) তাফসীরে রুহুল বয়ানে উল্ল্যেখ আছে– 'হযরত ইসমাইল মক্কী (রঃ) উদ্ধৃত করেছেন, বুজুর্গানে দ্বীনগণ শেষ দশ দিনের বেজোড় তারগুলোতে শবে কদরের নিয়তে তারা নফল নামাজ পড়তেন।' হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত– 'রাসুলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরের নিয়তে নফল নামাজে দণ্ডায়মান থাকে, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ হয়ে যায়। সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফ) শবে কদরের রাতে নফল নামাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। অন্য এক হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে আত্মসমর্পিত হৃদয় নিয়ে একাগ্রচিত্তে ইবাদতে কাটাবে, মহান আল্লাহ তার ইজ্জত ও মর্যাদা বহুগুণে বাড়িয়ে দিবেন।' তাই লাইলাতুল কদরে যে ব্যক্তি আল্লাহর আরাধনায় মশগুল থাকবে তার ওপর থেকে দোজখের আজাব হারাম করে দেওয়া হবে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন– 'সমস্ত রজনী আল্লাহতায়ালা লাইলাতুল কদর দ্বারাই সৌন্দর্যময় ও মোহনীয় করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা বরকতপূর্ণ এ রজনীতে বেশি বেশি জিকির করো। রাসুলুল্লাহ আরোও বলেন– 'তোমরা তোমাদের কবরকে আলোকিত পেতে চাইলে কদরের রাত ইবাদতে কাটিয়ে দাও। পবিত্র মাহে রমজানের পুণ্যময় এ রজনী বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমত, বরকত ও ক্ষমা লাভের এক অপূর্ব সুযোগ। মহিমান্বিত এ রজনীতে উচিত নিজেকে পরিচ্ছন্ন রেখে ফরজ নামাজ আদায় করা তার সাথে সান্নত নামাজসহ কোরআন তিলওয়াত করা। দোয়ার মাহফিলে শামিল হওয়া। বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা। রাতে না ঘুমিয়ে জিকির-আসকার করা, ধ্যান-মোরাকাবা করা, বেশি বেশি দান-সদকা দেয়া ও ভুখা বা অনাহারীকে খাবার খাওয়ানো। এমন আরোও যত ভালো কাজ আছে সেগুলো করা।

ইমামে আজম হযরত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্ট ছিলো এ ব্যাপারে বহু আগেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক গবেষক-বিশ্লেষকগণ একমত হয়েছেন। ইলমে তাসাউফপন্থি সূফী সাধকদের সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্ততা উল্লেখ করে, সূফীশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য কিতাব 'আলফুতুহাত ওয়াল আয়ওয়াক'এ লিখেন– ইমাম আবু হানিফা (রঃ) সূফী সাধকদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি শুধু ভালোই বাসতেন না বরং তাঁদের আধ্যাত্মিকতার স্তর ও জীবনযাত্রাকেও অনেক সম্মান করতেন। তাই প্রাচ্যবিদগণ দ্রুত ইসলামী ইলমের শিক্ষা জরুরীভাবে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া ও সুন্দর একটি রূপে রূপান্তরিত করার জন্য, তাঁর প্রতি গভীর মনোনিবেশ করেন। এভাবেই ইলমে তাসাউফের শিক্ষা-দীক্ষাকে সময়োপযোগী করার জন্য সূফী-সাধকগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাঁদের থেকে প্রাচ্যের বিখ্যাত পণ্ডিতগণও ইলমে তাসাউফের নিগুঢ় সন্ধান লাভের জন্য সূফী সাধকদের সঙ্গ নিতেন। তাই আসহাবে কুলুব ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের লেখাসহ যেকোন তথ্য বা তত্ত কাজে প্রাচ্যবিদগণের ইলমকে অনুসরণ করতেন। আর এই একনিষ্ট সূফী- যাঁদেরকে স্বয়ং রাসুল (সঃ) এ পৃথিবীর বুকেই শাফায়াত করেছেন, অর্থ্যাৎ মসজিদে নবুবীর বারান্দায় যাঁরা আল্লাহর ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন তাঁদেরকে রাসুল (সঃ) জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের সেই মহান ব্যক্তিবর্গের নির্লোভ সাধনা ও ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে ইলমে তাসাউফ শাস্ত্র। যে শাস্ত্র চর্চার মধ্যে রয়েছে নিরন্তর শান্তির সুশিতল পরশ। এ কারণেই একজন সূফীবাদ চর্চাকারীর জীবন-যাপন ও কর্মে অন্য দশজনের চেয়ে সামান্য হলেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু বহুকাল থেকেই সূফী-সাধকদের সরল প্রাণের সুযোগ ব্যবহার করে, ইসলাম ধর্মে এক শ্রেণির উগ্র ইয়াজিদী মুসলমান ভোগ-বিলাসের মোহে গোমরাহীর পথ বেছে নিয়েছেন। তাহলে প্রকৃত ইলমে তাসাউফ কোনটি? যেমন যেকোন বিষয়ের দুটি দিক থাকে, একটি ইতিবাচক অন্যটি নেতিবাচক। ইসবাত বা ইতিবাচক : ইতিবাচক তাসাউফ বলা হয় ঐ তাসাউফকে যা পবিত্র কোরআন-হাদিসের দ্বারা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ও আল্লাহকে পাওয়ার সুগম পথ পরিচালনা শিক্ষা দেয়। আমরা দেশ-বিদেশে অগনিত আশেক-জাকের ভাই-বোন সকলের অন্তপ্রাণের প্রিয় মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের কাছে ইলমে তাসাউফের মূল আদর্শ বা ইতিবাচক শিক্ষাই পেয়ে থাকি। অন্যদিকে মহান আল্লাহতায়ালার মনোনীত ইসলাম ও নূরনবী রাসুল (সঃ)এর মৌলিক আদর্শ তথা ইলমে তাসাউফ থেকে ছিটকে পড়া গোত্রই হলো তাসাউফের 'নফী' নেতিবাচক। তারা ইলমে তাসাউফ তথা সূফীবাদের অনুসারি ও পীর-ফকিরদের জীবনাদর্শকে বেদাআত বলে অপপ্রচার করেন। এ জন্যে অতি সাধারণ মানুষের কাছে তাদের অজ্ঞতা ও ভুলবশত কিছুটা সমর্থন পেলেও, তারাসহ বাকিরা প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ দরবারে চরম অপমানিত হওয়ার বন্দবস্ত পাকা করছেন। ইলমে তাসাউফ তথা সূফীবাদের উদ্ভব মধ্যপ্রাচ্য থেকে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার মধ্যপ্রাচ্য থেকে এবং ইসলামের মধ্যে মতের বিভক্তিও শুরু হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। তাই অনায়াসে বলা যায় এদেশে সূফীবাদের বিদ্বেষীরা ওইসব দেশেরই এজেন্ট হয়ে কাজ করছেন। যেমন স্বচ্ছ আয়নার উপর কাদা ছিটালে আয়নাটি আর পরিস্কারভাবে নিখুঁত প্রতিবিম্ব দেয় না। তেমনই তাদের অন্তর আত্মার ওপর কলুষতার কালি পড়ে গেছে, তাই সেখানে কোন দৃশ্য বা ধারণা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিতে আসে না। দুনিয়ার মোহে সেচ্ছায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বি রুপে আবির্ভূত হয়েছেন! কিন্তু ইমামে আজম আবু হানি-ফা (রঃ) এর জীবন আধ্যাত্মিকতার আমল দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। তাঁর দাদার নাম ছিলো জাওয়াহ। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নাম রাখেন নোমান। আর নোমানের সঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) এর সুসম্পর্ক ছিলো। যদি বলা হয় যে, ইলমে তাসাউফ তথা সূফীবাদের সুবিশাল শহর হলেন দয়াল নবী কারীম (সঃ) এবং সে শহরের দরোজা ছিলেন শের-এ খোদা হযরত আলী (রাঃ), সে শহরের ভিত্তি বা খুটি ছিলেন আমীরুল মোমেনীন হযরত আব বক্কর সিদ্দীক (রাঃ), সে শহরের দেয়াল ছিলেন আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং শহরের ছাদ ছিলেন আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান গনী (রাঃ)। একদিন হযরত নোমানের ঘরে একটি ছেলে সন্তান জন্ম নিলে তার নাম রাখা হয় সাবেত। হযরত নোমান নবজাত সন্তান সাবেতকে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে গেলেন দোয়া নিতে। হযরত আলী (রাঃ) নবজাতকের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। এরপর একদিন সাবেত বিন নোমানের ঘরে জন্ম হয় এক পুত্র সন্তান, সাবেত তার ছেলের নাম রাখলেন বাবার নামে 'নোমান' অপর নাম হলো আবু হানিফা। অর্থ্যাৎ নসবনামা হলো নোমান বিন সাবেত বিন নোমান। হযরত আবু হানিফা (রঃ)এর শিক্ষকদের শিক্ষক ছিলেন আমীরুর মোমেনীন হযরত আলী (রাঃ), আর এ থেকেই বোঝা যায় ইমামে আজম হযরত আবু হানিফা (রঃ) এর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতা ও বিশালতা সম্পর্কে। মহান আল্লাহরাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সময় থাকতে আধ্যাত্মিকতা বোঝা ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করার তাওফিক দান করুন আমিন।

পবিত্র মাহে রমজান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইনদা লিক্বাই রাবিহ্। অলা খালুফু ফামিছ ছইমি আতইয়াবু ইনদাল্লাহী মির রিহীল মিসকী। ওয়াছ ছিয়ামু জুন্নাতুন। ফাইযা কানা ইয়াওমু ছাওমী আহাদী কুম ফালা ইয়ারফুছ ওয়ালা ইয়াসখাব, ফাইন সারবাহু ফাল ইয়াকুল ইন্নিম রাউন ছ-ইমুন। [রাওয়াহুম সাইখান]

অথাৎ : রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বর্ধিত করে দেওয়া হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু রোজা এর উর্ধে কেননা বান্দাহ আমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য যৌন সম্ভোগ ও খানাপিনা ছেড়ে দেয়, সুতরাং আমি এর পুরস্কার দিব। রোজাদারের দুটি আনন্দ– প্রথম: ইফতারের সময়, দ্বিতীয়: আল্লাহ সঙ্গে মোলাকাতের সময়। নিশ্চয়ই রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধের চেয়ে আদরণীয়। রোযা ঢাল স্বরূপ, তোমাদের কেহ যেন রোযার দিনে জঘন্য কাজ ও বিবাদ বিসম্বাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে বিবাদ করতে চায়, তবে সে যেন বলে দেয় যে, আমি রোজাদার। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর সঙ্গে প্রেম করলে অন্তরে শান্তি আসে

সাইফুল ইসলাম দীপক

মানুষ লালসামুক্ত সরল প্রাণ না হলে সূফীবাদের যে জ্ঞান সমুদ্র, সে সমুদ্রের খবর কখনই জানতে পারবো না। যে জ্ঞান আত্মার মুক্তি বা আত্মশুদ্ধির একমাত্র পথ। যে পথে প্রেমই হলো একমাত্র পুঁজি। আর এ প্রেম হলো আত্মিক প্রেম। সহজ মানুষের সঙ্গে নিগুঢ় প্রেম-মহব্বত ছাড়া আল্লাহপ্রেমের খাঁটি প্রেমিক হওয়া যায় না। প্রেম চিরন্তন এক শক্তি, কুলকায়েনাত সৃষ্টির শুরুটাই প্রেম। শুধুই প্রেম। সাধনা করে আত্মপ্রেমের এ শক্তি অন্তরে ধারণ করতে পারলে কোন সাধনা বিফল হয় না। এবং এ সাধনার মাধ্যম্যে আল্লাহকে চেনা যায়। আল্লাহর অস্তিত্বকে অনুভব করা যায়। আল্লাহকে পাওয়ার জন্যই আমাদের শত চেষ্টা আর যত ইবাদত। সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সংযোগ হলেই সকলপ্রকার শান্তি আসে। সূফী-সাধনায় সিদ্ধি লাভকারী কামেল মোকাম্মেল অলি-আল্লাহগণ সময় ও সমাজের দীক্ষাগুরু, যার অন্তরের কান্না শুধুই মানুষের মুক্তির জন্য। তাঁরা সব সময় অতীন্দ্রিয় জগতে অবস্থান করতে পারেন, মানুষকে ভালোবাসতে পারেন। শুধু মানুষ কেন সৃষ্টির সকল কিছুকেই অবলীলায় ভালোবাসতে পারেন। আমরা সাধারণ মানুষ তা পারি না। আমার কামেল মুর্শিদ কুতুববাগী কেবলাজান বলেন– 'বাবা অন্যের দোষ তালাশ করার আগে নিজের দোষ তালাশ করেন'। এ অমোঘ সত্য বাক্য প্রতিনিয়তই শুনি, কিন্তু সঠিকভাবে তা মানতে পারছি না। প্রায় সময়ই অন্যের দোষ তালাশে ব্যস্ত থাকি! এখন মনে হয় নিজের মধ্যে সেই চিরন্তন প্রেমের অভাব। যে প্রেমে অলি-আল্লাহগণ দয়াল নবীর প্রেমে ডুবে থাকেন। ধনি গরীব, জাতি, গোত্র, ধর্ম-বর্ণ, উঁচু-নিচু, পাপী-তাপী কাউকেই অবহেলা করেন না। সবাইকে আপন করে নিতে পারেন এটা তাঁর মহৎ গুণ। এইসব গুণ ও জ্ঞানের অধিকারী খাজাবাবা কুতুববাগী পীরকেবলাজান।

একবার চিন্তা করে দেখি তো, যদি সত্যি কাউকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তবে কি তার দোষ-ক্রটি খুঁজি কিনা? অন্যের কাছে তা গোপনে বা প্রকাশ্যে তুলে ধরি কিনা? তাকে অন্যের সামনে ছোট করতে পেরে আমি আনন্দিত হই কি না? আসলে একজন সুস্থ মানুষ তা পারেন না। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যতপ্রকার পাপ করি তার মধ্যে সব চেয়ে বড় পাপ 'গীবত' প্রায়ই করে থাকি। কারণ, আমাদের অন্তরে ভক্তি-প্রেমের খুব অভাব! যদি আল্লাহকে ভালোবাসি তবে তাঁর সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ থাকা জরুরী। একটু খেয়াল করে দেখলেই তা বুঝতে পারবো, আমরা যে যাকে ভালোবাসি তার দোষ-ক্রটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখি কি না? নিজেকে বড় না ভেবে অন্যকে বড় ভাবতেই আনন্দ পাই কি না? আল্লাহর প্রেমিকদের আমিত্ব থাকে না, মানুষের সেবা আর মানবতার পক্ষে থাকেন। সবসময় অপূর্ব এক প্রেমভাব মনে বিরাজ করতে থাকে। মনে শান্তির পরশ অনুভব হয়। তবে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো সরল কোমল অনুভূতি কামেল গুরুর দীক্ষা ছাড়া সহজে কেউ লাভ করতে পারে না। কামেলগুরু যিনি কঠোর সাধনার বলে সেই মাকাম অর্জন করে পেয়েছেন আল্লাহর প্রেমময় সত্বার সন্ধান।

আমি দেখেছি এবং শুনেছি কিছু মানুষ কুতুববাগী কেবলাজান সম্বন্ধে সমালোচনা করে, কটু কথা বলে। যদি কখনো এ কথা কোন জাকের ভাই অতি আদবের সঙ্গে কেবলাজানের কাছে বলেছেন, তিনি সমালোচনাকারীদের প্রতি কখনো রাগ অথবা অভিশাপ দেন না, বরং বলেন– 'বাবা, তারা এ সব না বুঝে বলে, তাদের ভিতরে আসল বুঝ থাকলে কখনও বলত না'। পৃথিবীতে খুব কম মানুষ আছেন যারা নিজেদের সম্পর্কে কটু কথা শুনলেও মনে মনে রাগ হয় না বা উত্তেজিত হয়ে গালমন্দ করি না। আল্লাহর বন্ধুরা স্রষ্টার প্রেমে এমন গভীরভাবে নিমগ্ন থাকেন যে, সকল সৃষ্টির মধ্যেই তারা আল্লাহকে দেখতে পান। যেন তৌহিদের সাগরে ডুবে থাকা মহা ডুবুরী, তাঁরা সৃষ্টি থেকে স্রষ্টাকে আলাদা ভাবতে পারেন না। এ জন্যই তারা কাউকে দোষারোপ করেন না, অভিশাপ দেন না, কারো ক্ষতি করেন না, সবার জন্য সর্বদা কল্যাণ কামনা করেন। আল্লাহর প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য গুণাবলী তাঁর বিশেষ বিশেষ বান্দার মধ্যে কিছু গচ্ছিত রেখে, আরশে আজিমে বসে সারা-জাহান পরিচালনা করছেন তিনি। আমাদের আসল কাজ হওয়া উচিৎ সে সব সত্যবাদি মানুষের সঙ্গ লাভ করে নিজের মধ্যে এসব গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো। চম্বুকে যেমন লোহা আকড়ে ধরে তেমনিভাবে মুর্শিদের পবিত্র অন্তরের সঙ্গে নিজেদের অপবিত্র অন্তরকে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারলেই সফল কাম হতে পারবো আমরা।

নিখুঁত ইবাদত জিকির

শেষ পৃষ্ঠার পর

করেছেন– ‘নির্জন একাকী মানুষগুলো অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।’ সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, নির্জন একাকী মানুষ কারা? নবীজি (সঃ) উত্তরে বললেন, তারা ওইসব নারী-পুরুষ, যারা আল্লাহর জিকির করে’ (মুসলিম শরীফ, হাদিস: ২০৬২)। আল্লাহর জাতপাকের জিকির হলো নিখুঁত ইবাদত, যে ইবাদতের মধ্যে ভুলত্রুটির আশঙ্কাও থাকে না। নামাজ আল্লাহতায়ালার হুকুম। ইসমেজাতের জিকিরও আল্লাহর হুকুম। এ সকল হুকুম শুধু আল্লাহর স্মরণার্থেই। তবে সঠিকটা না জেনে বুঝে উদ্দেশ্যহীন নামাজ কিংবা জিকির করলেই হবে না। যে কোন বিষয়ের যেমন দিক, উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্যবস্তু থাকে এবং সেটা নির্ধারণ করে, মন সংযোগ দিয়ে চর্চা-শ্রম দিলে সফলতা আসবেই। এ সাফল্য জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে, জীবনের যে কোন মহৎ ও ভালো অর্জন কখনোও এককভাবে আসে না, একান্তভাবে আস্থাশীল কাউকে না কাউকে লাগে। যেমন, যেই রোগের যে ডাক্তার কেবল তিনিই পারেন সঠিক রোগ চিনে সঠিক চিকিৎসা দিতে এবং এতে রোগমুক্ত হওয়া যায়। কলবের মুখে আল্লাহর জিকির না থাকা একটি মহা রোগ, জিকিরহীন মানুষ মাত্রেই সে রোগের রোগী সবাই। সংসারে একজন দূরারোগ্য কঠিন রোগী যেমন আস্তে আস্তে কর্মহীন হয়ে পড়েন, তেমনই কলবে আল্লাহর জিকিরহীন ব্যক্তিও আল্লাহর দরবারে অচল-পাপী হিসেবে চিহ্নিত হন। তবে, কলবের মুখে জিকির জারি আপনাআপনি হয় না, কামেল-মোকাম্মেল পীরের খাস তাওয়াজ্জহ্ বা স্পর্শ লাগে। কারণ, আল্লাহর করুণা ও সান্নিধ্যে পেতে হলে, আগে কলবের মুখ চিনতে হবে। কোথায় সে মুখ? কোন মুখে ডাকলে পাওয়া যাবে মহান সৃষ্টিকর্তাকে? আল্লাহকে শুধু মুখে মুখে ডাকলেই সে ডাকের সাড়া মিলবে কি না? সে বিষয়ে আল্লাহতায়ালাই ভালো জানেন। পীরে-কামেল মুর্শিদে মোকাম্মেল খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের দেখানো পথের কোন বাঁক নেই, সরল রেখার মতো সোজা রাস্তা। এবং এ রাস্তায় চলতে কোন প্রতিবন্ধকতাও নেই। আছে আল্লাহর অফুরন্ত রহমত, বরকত ও নিয়ামত। যা মহান আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকেই আসতে থাকে। আমরা এ কথার সত্যতা বিভিন্ন প্রাজ্ঞ মনীষীদের রচিত অমূল্য গ্রন্থমালার মধ্যে দেখতে পাই। আর এ কথাই চিরদিন সত্য বলে বিশ্বাস করি যে, ধ্যান-জ্ঞান ছাড়া কস্মিনকালেও আল্লাহকে দেখা যাবে না, পাওয়া যাবে না। আমরা জানি, দেখি ও শুনি যাপিত জীবনেই দিন শেষে কেউ কোটিপতি, কারো নুন আনতে পান্তা ফুরোয় জলে! এ সত্য আর কঠিন বাস্তব। দিন শেষে আল্লাহতায়ালার ইবাদতের বেলায়ও প্রাপ্তি আছে। যার যেমন কাজ বা ইবাদত, তার প্রাপ্তিও তেমন।

কুতুববাগী পীরকেবলাজান তালিমীশিক্ষা দানের সময় বলে থাকেন– ‘বাবারা, চব্বিশ ঘন্টায়, চব্বিশ হাজার ছয়শত বার কোন কোন কিতাবে আছে, একুশ হাজার

ছয়শত বার মানুষের দম আসা-যাওয়া করে, এ সময়ে যদি প্রত্যেক দমের সাথে কলবের মুখে সার্বক্ষণিক আল্লাহর জিকির থাকে, তবে এর চেয়ে নিখুঁত ইবাদত আর নাই।’ পবিত্র হাদিসে কুদসিতে এসেছে– আল্লাহতায়ালা বলেন, ‘বান্দা আমাকে যেমন ধারণা করে, আমাকে তেমনই পাবে। যখন সে জিকির (স্মরণ) করে, আমি তার সঙ্গে থাকি। সে যদি তার অন্তরে আমার জিকির করে, তাহলে আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন জনগোষ্ঠীর সামনে আমার জিকির করে, তাহলে আমি তাদের চেয়ে উত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে তাকে স্মরণ করি।’ (মুসলিম শরীফ, হাদিস-২০৬১), আল্লাহতায়ালাও অন্তরের মুখে জিকিরের (স্মরণ) প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আমরা নামাজে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেবের তেলওয়াতের প্রতি কান দিয়ে থাকলেও, মনের ভিতর নানান গুঞ্জন যেন অন্তরকে তোলপার করে তোলে, যা অনেক চেষ্টাতেও দমিয়ে রাখা কঠিন। আর এভাবেই একসময় ওয়াক্তের নামাজ শেষ করে যার কাজে সে যুক্ত হই। কিন্তু ইবাদত হওয়া উচিৎ সৃষ্টিকে ভুলে স্রষ্টার প্রেমে দিল-মন একাকার করে সমর্পিত হয়ে আদায় করা। আমরা তা কতটুকু করতে পারছি? বর্তমানসহ যে কোনও সময় থেকেই আমাদের মধ্যে নামাজ শুদ্ধভাবে আদায় ও প্রতিষ্ঠা না হওয়ার কারণে, বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী আর হিংসা অশান্তির দাবানল লেগেই আছে। আধুনিকতার নামে সভ্যতা ও মানবতা থেকে কতখানি দূরে সরে আছি আমরা, তা ভাবতে গেলেও মূর্ছা যেতে হয়! কুতুববাগী পীর কেবলাজান আরো বলে থাকেন– ‘মানুষকে নামাজের মধ্যেই শয়তান সবচেয়ে বেশি ধোঁকা দিয়ে থাকে।’ সত্যিই তো, শয়তানকে না তাড়িয়ে নামাজে দাঁড়ালে তার ধোঁকা থেকে কখনোই রক্ষা নাই।’ তাই আমাদের উচিৎ হুজুরি (একাগ্রচিত্ত) দিলে নামাজ আদায় ও প্রতিষ্ঠা করে চলা।

জিকির সম্পর্কে সুরা, রাদ’-এর ২৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহতায়ালা বলেন– ‘(আল্লাহর দিকে অভিমুখী হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক তারাই) যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়। জেনে রেখো, শুধু আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।’ এ আয়াতের মধ্যে মহান আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে তাঁর জন্য ইবাদতের সহজ সুন্দর ও নিখুঁত উপায় নির্দেশ করেছেন। যেমন কষ্টবিহীন মনোরম এক ইবাদতের নাম জিকির-এ ‘খফী’। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও জিকিরের ‘খফী’ ইবাদত করা যায়, তাতে কোন খেলাপ হয় না বরং ঈমানদারদের অন্তর জাগ্রত হয় এবং প্রশান্তির পরিসর কল্পনাতীতভাবে বাড়তে থাকে। জিকিরের মাধ্যমে শয়তানের প্ররোচণা থেকে মুক্ত থাকা যায়। পবিত্র কোরআনের সুরা আরাফ-এর ২০১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন– ‘যারা পরহেজগার, শয়তান যখন তাদের কুমন্ত্রণা দেয়, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তৎক্ষণাত তাদের চোখ খুলে যায়।’ মহানবী (সঃ) বলেছেন– ‘যে ব্যক্তি তার রবের জিকির করে, আর যে জিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো, জীবিত এবং মৃতের মতো।’ (বোখারি শরীফ, হাদিস- ৯৫৮৭), সার কথা, জিকিরকারীর অন্তর চিরজাগ্রত থাকে। অন্তরের মুখে আল্লাহর জিকির এক মহা নিয়ামত ও নিখুঁত ইবাদত। হে আল্লাহ! পরম বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে আপনার জিকির-স্মরণ অন্তরে নিয়েই যেন আপনার ডাকে হাজির হতে পারি, সবাইকে সে তাওফিক দান করেন, আমিন।

লেখা ও বিজ্ঞাপণ আহ্বান

মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায় সূলভ মূল্যে বিজ্ঞাপণ আহ্বান করা হলো। আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রসারে আমরাও ভূমিকা রাখতে চাই।

ইলমে তাসাউফ তথা সূফীবাদ সম্পর্কে আপনাদের লেখা এবং আত্মার আলো’তে প্রকাশিত লেখা নিয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আহ্বান করা হলো। আমরা গুরুত্বের সঙ্গে তা প্রকাশ করবো লেখা ও বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ করুন নিচের ঠিকানায়।

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৩৪৮২২৯৪, ০২-৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

সূফীবাদ কী? এর উদ্দেশ্য

শেষ পৃষ্ঠার পর

মূল উদ্দেশ্য। যাঁরা আল্লাহর প্রেম অর্জন করেছেন, তাঁদের তরিকা বা পথ অনুসরণ করে ফানাফিল্লাহর মাধ্যমে বাকাবিল্লাহ অর্জন করাই হলো সূফীদর্শন। রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর সত্য তরিকার মূল আদর্শিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান অধ্যায় সূফীবাদ এর প্রসার লাভ করে পারস্যে। সেখানকার প্রখ্যাত সূফী-দরবেশ এবং দার্শনিকগণ নানান শাস্ত্র ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করে সূফী দর্শনকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত এবং জনপ্রিয় করে তোলেন। সময়ের পরিক্রমায় বিখ্যাত অলি-আউলিয়া-কেরামদেরকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন তরিকা গড়ে ওঠে। সে সব তরিকার মধ্যে প্রধান চারটি তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সে চারটি তরিকা যথাক্রমে: এক, পীরানে পীর গাউসুল আজম বড়পীর হযরত মহিউদ্দিন আবদুল কাদির জিলানী বাগদাদী (রঃ) এর প্রতিষ্ঠিত কাদরিয়া তরিকা। দুই, সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী আজমিরী (রঃ) এর প্রতিষ্ঠিত চিশতীয়া তরিকা। তিন, খাজায়ে খাজেগান হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ বোখারী (রঃ) এর প্রতিষ্ঠিত নকশবন্দিয়া তরিকা। চার, কাইউমে জামানী, মাহবুবে সুবহানী, রাফিয়েল মাকানী, হাইকিলে নূরানী, মুশকিলে আসানী হযরত শেখ আহমদ শেরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী আল ফারুকী (রঃ) এর প্রতিষ্ঠিত মোজাদ্দেদিয়া তরিকা। মহান সেই মোজাদ্দেদিয়া তরিকারই খেলাফতপ্রাপ্ত কামেল- মোকাম্মেল পীর এ শতকের মোজাদ্দেদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় কুতুববাগ দরবার শরীফ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দরবার।

কুতুববাগীর শিক্ষা

শেষ পৃষ্ঠার পর

যে ডাকা যায়, সেই শিক্ষাও দিয়ে থাকেন খাজাবাবা কুতুববাগী। খাজাবাবার শিক্ষার উল্লেখযোগ্য দিক হলো, জীবন যাপনের নিশানা ঠিক করার শিক্ষা। বাবাজান শিক্ষা দিয়ে থাকেন- জবানের শিক্ষা, তথা সংযমের শিক্ষা। কোন ধরনের কথা বলা উচিত না, তা বেশ জোর দিয়ে সারা বছর শিক্ষা দেন খাজাবাবা কুতুববাগী। তিনি বলেন, অন্যের বিরুদ্ধে লাগার আগে নিজের বিরুদ্ধে লাগতে হবে। তিনি বলেন, জীবনের সবচেয়ে বড় জেহাদ হলো, নিজের বিরুদ্ধে লাগ- নিজের দোষক্রটি দেখা। নিজেকে সংশোধন করার ওপরই খাজাবাবা জোর দিয়ে থাকেন। এটিই তার সবচেয়ে বড় শিক্ষা। এটি কি জীবনের অন্যতম বড় সংযম নয়। জীবনাচারে সংযমের ওপর খাজাবাব সারা বছরই জোর দিয়ে থাকেন। মুখের সংযম, জবানের সংযম, খাদ্যের সংযম, বেশি বেশি করে আল্লাহ রাসুলের নাম নেওয়া। অন্যভাবে বললে, রোজার যে শিক্ষা, তা সারা বছরই কুতুববাগ দরবার শরিফে চর্চা করা হয়। আর এই চর্চার নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন খাজাবাবা কুতুববাগী। তাঁর নেতৃত্বে অগনিত আশেক-জাকের বছরের পর বছর ধরে আত্মসংযমের শিক্ষা নিয়ে আলোকিত করে তুলেছেন নিজেদের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা। এই সংযমই শুদ্ধ জীবনাচার, যার জন্য তৃষ্ণার্ত মানুষের অন্তপ্রাণ চেষ্টা সৃষ্টির পর থেকেই।

কিছু সংখ্যক আলেমের

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমার বক্তব্য হলো তারাও আল্লাহকে ভয় করেন, কিন্তু রাসুল (সঃ) এর শ্রেষ্ঠত্ব মানতে পারেন না! তারা তো জানেন যে, রাসুল (সঃ) কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহতায়ালা পৃথিবীই সৃষ্টি করতেন না। যিনি কুলকায়েনাতের রাহমাতুল্লিল আলামিন সেই প্রিয় রাসুল (সঃ)কে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মনে করার যুক্তি তারা কোথায় পান?

‘আবুদাউদ শরীফে শরাহ বজলুল মজহুদ’ কিতাবের প্রণেতা হযরত মাওলানা খলীল আহমদ আম্বিটবী, তাঁর কিতাবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন– ‘আমাদের নিকট ওহাবী ফের্কার হুকুম উহাই যাহা আল্লামা শামী বর্ণনা করিয়াছেন। তাহারা একটি অত্যাচারী খারেজী দল। ইহারা অন্যায়ভাবে মক্কা শরীফের ইমামের ওপর হামলা করিয়াছিল। ইসলামের এমন এক ব্যাখ্যা বাহির করিয়াছিল, যাহার দরুন তাহারা ইমামকে কতল করা ওয়াজেব মনে করিত। এবং উক্ত ব্যাখ্যার অনুবর্তী হইয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের লোকদের জানমাল হালাল মনে করিত। এবং তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাদী বানাইত। সেহেতু মওদুদী জামায়াতের স্বরুপ প্রকাশনায় দারুল এশায়েত ছারছিনা, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ সাল, পৃষ্ঠা নং ২৫।’ মাওলানা খলীল আহমদ সাহেবের জওয়াবের সমর্থনে নিম্নলিখিত ওলামায়ে কেরাম দস্তখত করিয়াছেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দ। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব, মাওলানা সৈয়দ আহমদ হাসান আসরারী সাহেব, মাওলানা আজীজুর রহমান দেওবন্দী সাহেব এবং মাওলানা হাবীবুর রহমান দেওবন্দী সাহেব। ওহাবী ফের্কা গোমরাহী সম্পর্কে উপরের উদ্ধৃতিগুলো যথেষ্ট। এ ছাড়াও যেখানে দয়াল নবী (সঃ) নিজেই তাদের ব্যাপারে এমন ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতবাণী করেছেন, তারপরও তাদের মিথ্যা ও মনগড়া মতবাদ শান্তিকামী মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ছাড়া আর কী হতে পারে?

ওহাবী মতবাদের ভ্রান্ত আকিদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে কিছু আলোচনা করছি। প্রথম ভুল মতবাদের আকিদা হচ্ছে, ‘পীরের উছিলা’ ধরা শিরক। অথচ পবিত্র কোরআনে সুরা মায়িদার পঁয়ত্রিশ নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– ‘ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানুত্তাকুল্লাহ্ অবতাগু ইলাইহিল উছিলাহ।’ অর্থ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহতায়ালাকে ভয় কর। এবং তাঁকে

আশরাফ আলী থানবী সাহেব, মাওলানা সৈয়দ আহমদ হাসান আসরারী সাহেব, মাওলানা আজীজুর রহমান দেওবন্দী সাহেব এবং মাওলানা হাবীবুর রহমান দেওবন্দী সাহেব।

পাওয়ার জন্য উছিলা (মাধ্যম) অন্বেষণ কর। যেখানে উছিলা ধরার জন্য আদেশ করেছেন, সেখানে তারা বিরোধীতা করে মূলত: আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করছেন, আর আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী নি:সন্দেহে জাহান্নামী। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আত্মার আলো পত্রিকায় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের লিখিত ‘পবিত্র কোরআনের আলোকে উছিলা অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় মতবাদ হচ্ছে– ‘অলিআল্লাহর নিকট রূহানী সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। এরা মূলত: মুহাম্মদী ইসলাম তথা অলিআল্লাহর কাছ থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এটি তাদের শয়তানী ফন্দি। যেখানে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) রাসুল (সঃ) এর তাওয়াজ্জহ্ ব্যতিত পূর্ণ মুমিন হতে পারেননি, সেখানে সাধারণ মানুষ কীভাবে অলিআউলিয়ার তাওয়াজ্জহ্ ব্যতিত পূর্ণ মুমিন হবো? তাদের অন্য একটি বাতিল মতবাদ হলো আউলিয়া কেরামের মাজার জিয়ারত শিরক।’ এ মতবাদের দ্বারা তারা মূলত: অলি-আউলিয়াগণের রূহানী তাওয়াজ্জহ্ থেকে সাধারণ মানুষকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন। অথচ পীরকামেলের তাওয়াজ্জুহ পেলে মানুষের অন্তর পবিত্র হয়, মহান আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, নামাজে একাগ্রতা আসে। আউলিয়াকেরাম ও বুর্জুগাণে দ্বীনের মাজার জিয়ারত ও রাসুল (সঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের নিয়তে দূর দেশ থেকে সফর করে যাওয়া জায়েজ এবং বিশেষ সওয়াবের কাজ। শামী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ‘জিয়ারতে কবুর’ অধ্যায়ে লিখিত আছে– ‘আল্লাহর নৈকট্যলাভের ব্যাপারে আউলিয়াকেরামের পদ মর্যাদায় তারতম্য আছে। এবং তাদের মারেফতে এলাহী ও তত্বজ্ঞানের তারতম্য হিসেবে জিয়ারতকারীগণ উপকৃত হয়ে থাকেন। ওহাবীদের আরেকটি ভুল মতবাদ হচ্ছে, অলিআউলিয়া কিংবা ইন্তেকালপ্রাপ্ত অন্য লোকের রূহের প্রতি ইছালে সওয়াব বা ফাতেহাখানির আয়োজন করা নাজায়েজ। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন– ‘ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আ-মানু ইয়া-না-যাইতুমুর রাসুলা ফাকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাই নাজওয়া-কুম সাদাকাতাং।’ অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা রাসুলের সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে, নজর প্রদান করবে’ (সুরা, মুজাদিলা। আয়াত-১২)। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ‘খোলাছাতুত্তাফছিরে’ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ আয়াতে নির্দেশ অনুযায়ি যখন কোন ব্যক্তি হুজুর (সঃ) এর দরবারে উপস্থিত হতেন, তখন আগত ব্যক্তি হুজুর (সঃ)কে নজরানা প্রদান করতেন। সচেতন পাঠকের কাছেই প্রশ্ন, আপনারাই বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবেন যে, যারা আল্লাহর কোরআন ও রাসুল (সঃ) এর হাদিসকে অস্বীকার করে, তারা কি মুসলমান হতে পারেন? কারণ, আল্লাহ বলেছেন, যারা কোরআনের একটি হরফ বা অক্ষরকে অস্বীকার করবে তারা জাহান্নামী।

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আত্মার আলো

সূফীবাদ কী? এর উদ্দেশ্য এবং তরিকত

মাওলানা মতিউর রহমান এছলাহী আল মোজাদ্দেদী

এ সময়ে সূফীবাদ সম্পর্কে আধুনিক প্রজন্মের অনেক মানুষ ভাসা ভাসা ধারণা রাখলেও, বেশির ভাগ মানুষই জানেন না প্রকৃত পক্ষে সূফীবাদ কী? অথবা এ ভাবধারার কর্ম-পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং মূল উদ্ভাবক ও প্রবর্তক কে বা কারা? এ নিবন্ধে খুব সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি। পৃথিবীতে আদম (আঃ)কে সৃষ্টির শুরু থেকেই পরম সত্তা মহান আল্লাহতায়ালাকে জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে আল্লাহকে জানার প্রচেষ্টাকে সূফী দর্শন বা সূফীবাদ বলা হয়। বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর মতে– 'আল্লাহ ব্যতীত অপর মন্দ সবকিছু থেকে আত্মাকে পবিত্র করে সর্বদা আল্লাহর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন হওয়ার নামই সূফীবাদ।' আমাদের জানা দরকার আরবী 'সূফ' শব্দের অর্থ পশম এবং 'তাসাউফ' শব্দের অর্থ পশমী' অর্থ্যাৎ, পশমী বস্ত্র পরিধানের অভ্যাস (লাবসু'স-সূফ)- মরমীবাদের সাধনায় জীবনকে নিয়োজিত করার কাজকে তাসাউফ বলা হয়। যিনি নিজেকে এই সাধনায় সমর্পিত করেন, ইসলামের পরিভাষায় তিনিই সূফী নামে অভিহিত হন। ইসলামের পরিভাষায় সূফীবাদকেই ইলমে তাসাউফ বলা হয়, যার অর্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞান। ইলমে তাসাউফ বা সূফীবাদ বলতে অবিনশ্বর আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনাকেই বুঝায়। আত্মার পবিত্রতার মাধ্যমে 'ফানাফিল্লাহ' (আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান করা), এবং ফানাফিল্লাহ অর্জন করা যায়। যেহেতু, মহান আল্লাহতায়ালা নিরাকার, তাই তাঁর মধ্যে ফানা হওয়ার জন্য প্রেমই একমাত্র মাধ্যম। ইলমে তাসাউফের সাধনাকে 'তরিকত' বা আল্লাহ-প্রাপ্তির পথ বলা হয়। তরিকত সাধনায় মুর্শিদ বা পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন হয় এবং আল্লাহকে পাওয়ার সহজ ও সাবলীল পথই হলো ফানা-ফিশ-শায়েখ বা ফানা-ফির-রাসুল ও ফানাফিল্লাহ। ফানাফিল্লাহর স্তর পার হওয়ার পর বাকা-বিল্লাহ লাভ করতে হয়। বাকা-বিল্লাহ অর্জিত হলেই কেবল সূফী দর্শন অনুযায়ী সূফীগণ মহান আল্লাহ প্রদত্ত (ইলমে লাদুন্নাহ) বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হন। তখন সূফীর অন্তরে সার্বক্ষণিক শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে। আর তা হবেই না বা কেন? কারণ, স্বয়ং রাসুলে আকরাম (সঃ) সূফীদর্শনের প্রবর্তক। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন– 'মানব দেহের মধ্যে একটি বিশেষ অঙ্গ আছে, যা পবিত্র থাকলে সমগ্র শরীর পরিশুদ্ধ থাকে এবং অপবিত্র থাকলে সমগ্র শরীর অপবিত্র থাকে, জেনে রাখো এটি হলো 'কলব' বা 'হৃদয়' যা শুধু আল্লাহর জিকির বা স্মরণে কলুষমুক্ত হয়। সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই কলবকে কলুষমুক্ত করে, মহান আল্লাহর করুণা অর্জন করাই সূফীবাদের ৩-এর পাতায় দেখুন

কুতুববাগীর শিক্ষা ও সংযমের মাস

খালেদ ফারুকী আল মোজাদ্দেদী

শুধু মুসলিম ধর্মাবলম্বী নয়, এর আগে নাজিল হওয়া সকল ধর্মের মানুষের জন্য রোজা অবশ্য পালনীয় বা ফরজ ছিলো। সমাজের বৃহত্তর সাধারণ মানুষ রোজা মানে প্রধানত ও প্রথমত বুঝে থাকেন পানাহার থেকে বিরত থাকা। পানাহার থেকে বিরত থাকা রোজা পালনের বৃহত্তর সংযম পালনের একটি অংশ মাত্র। এর পরও রয়েছে আরও নানা সংযম। নানান সংযমের সমন্বয়েই পবিত্র রমজান। রমজানের নানা সংযমের শিক্ষা বছরব্যাপী দেয়া হয় কুতুববাগ দরবার শরীফে।

রোজার সার্বিক অর্থ হলো সংযম। জীবনের সকল আচারে বাহুল্য ব্যবহার পরিত্যাগ করে সংযম পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে রোজার মাধ্যমে। মূলত সারাবছরই রোজার ন্যায় যেন মানব জাতি একটি সুষ্ঠু নিরাপদ জীবন-যাপন করতে পারে তার একটি নমুনা মাস মাহে রমজানে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চান, আমরা সবাই সারাবছর রোজার ন্যায় সংযমী জীবন-যাপন করি। রোজায় সংযম পালনের অন্যতম অংশ দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকা। আরও রয়েছে নানা সংযম। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মুখের সংযম, দৃষ্টির সংযম, জবানের সংযম, সময়ের সংযম (সময় অপব্যয় না করে বেশি করে আল্লাহ-রাসুলের নাম নেওয়া) যাপিত জীবনের সংযমসহ আরো অনেক কিছু। উল্লেখ্য- এ সকল বিষয়ই সারাবছর কুতুববাগ দরবার শরীফে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। দরবার শরীফের পীর কেবলাজান খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী সারাবছর ভক্তদের অতি যত্ন ও ধৈর্যের সঙ্গে এই শিক্ষাগুলো দিয়ে থাকেন।

বছরের প্রায় প্রতিদিনই খাজাবাবা কুতুববাগী সাধারণ মানুষ তথা ভক্তদের দয়াল নবী (সঃ) এর শিক্ষাদানের জন্য সময় দিয়ে থাকেন। সংযমের মাসে যেভাবে বেশি বেশি করে আল্লাহ রাসুলের নাম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সারাবছরই এই শিক্ষা দেওয়া হয় কুতুববাগে। তা ছাড়াও রয়েছে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত, দোয়া কবুলের রাত হিসেবে গুরুরাত্রি পালন করা হয়। এই রাতে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান এশার নামাজের পর থেকে ভোররাত পর্যন্ত জেগে থেকে ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহ-রাসুলের নাম ধরে ডাকার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এটি আমাদের জীবনের জন্য এক পরম শিক্ষা। কেউ এ শিক্ষা গ্রহণ না করলে তার জীবন একেবারে অপূর্ণই থেকে যায় বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) যে আমাদের এতো কাছেই আছেন এবং আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)কে এত সুন্দরভাবে ৩-এর পাতায় দেখুন

নিখুঁত ইবাদত জিকির ঈমানদারদের অন্তর জাগ্রত করে

সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সুরা, ত্ব-হা, ১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন– 'নামাজ কায়েম কর আমার জিকির বা স্মরণার্থে।' সবচেয়ে সরল ও সুন্দর নিখুঁত এক ইবাদত নাম 'জিকিরে খফী' কলবের জিকির। আধ্যাত্মিক মহা-সাধক খাজাবাবা কুতুববাগী পীরকেবলাজান বলে থাকেন– 'চৈতন্য বা দিব্যজ্ঞান ছাড়া কেউ আল্লাহর দেখা পাবেন না।' এ জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রথম শর্ত হলো চৈতন্য কামেল গুরুর হাতে শিক্ষা-দীক্ষা নেওয়া। জিকিরই হলো একমাত্র শান্তি। আল্লাহতায়ালার মহান সৃষ্টির আঠারো হাজার মাখলুকাতই এক আল্লাহর জিকির করেন। আর নামাজ মানুষের তথা মুসলমানদের জন্য ফরজ করেছেন, বাকি সতেরো হাজার নয়শত নিরানব্বইটি মাখলুক শুধু জিকির ও তাসবীহতে মশগুল। আল্লাহর জিকির থেকে কেউই বিরত নেই। এবং আল্লাহর নিদর্শন নেই এমন কোন স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেখানে সৃষ্টি আছে সেখানেই আল্লাহর উপস্থিতি।

বিশ্বজুড়ে অগনিত তরিকাপন্থি জাকের 'জিকিরকারী' ভাই-বোন, পীরভাই-বোন, কুতুববাগী পীর কেবলাজানের শিক্ষা 'আত্মশুদ্ধি, দিলজিন্দা, নামাজে হুজুরি' অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করি। পীর কেবলাজান বলেন, 'যার কামেলপীর আছে, তার আল্লাহ, তার সঙ্গে আছেন।' সত্যিই তো, যে হৃদয় যত বেশি আল্লাহর দিকে সমর্পিত হয়ে অন্তরে জিকিরের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রেমে বিভোর থাকতে পারেন, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ ৩-এর পাতায় দেখুন

ইসলাম ধর্মের শিংওয়ালা শত্রু

কিছু সংখ্যক আলেমের মনগড়া দশটি মতবাদ

মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন

হিজরী দ্বাদশ শতকে আরবের নজদ নামক স্থানে মুহাম্মদ আব্দুল ওহাব নজদীর উদ্ভব হয়। তিনি যে বাতিল মতবাদ প্রচার করে এটাকে 'ওহাবী আন্দলন' নামে অভিহিত করেছেন এবং এ মতবাদের সমর্থকগণ ওহাবী নামেই পরিচিত। এদের ফেৎনা সম্পর্কে মেশকাত শরীফের 'জিকরুল্লাহ আল ইয়ামন' অধ্যায়ে বর্ণিত আছে– 'এক সময় রাসুল (সঃ) এরশাদ করলেন– 'আয় খোদা! আপনি শামদেশে বরকৎ দান করুন। আয় খোদা! আপনি আমাদের ইয়ামেন দেশে বরকৎ দান করুন।' উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হইতে কতকে আরজ করিলেন– 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নজদের জন্যও দোয়া করুন।' কিন্তু রাসুল (সঃ) এবারও শাম ও ইয়ামেনের জন্য দোয়া করলেন। পুনরায় নজদের জন্য দোয়ার আবেদন করা হইলো। হাদিস বর্ণনাকারী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন– রাসুল (সঃ) তৃতীয়বার এরশাদ করলেন– 'সেখান হইতে তো বহু ফেৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হইবে এবং শয়তানের দল বাহির হইবে।' (বোখারী শরীফ) ৩-এর পাতায় দেখুন

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়

+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

+M Ambulance Service

ICU, CCU, NICU & PICU

লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী ফ্রিজিংসহ সকল প্রকার গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়।

বি:দ্র: জরুরীভিত্তিতে রোগীদের জন্য এসি, নন-এসি, অক্সিজেন, আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ এবং পিআইসিইউ গাড়ির ব্যবস্থা আছে

৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।

মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭

www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.